প্রথম আলো

ইফতেখার মাহমুদ

১১ আগস্ট ২০১৮

বন্যায় ডুববে না স্বপ্নের বাড়ি

প্রতিবছরের বন্যায় পদ্মাপারের বেশির ভাগ বাড়ি ডুবে যায়। ঝড় বা দমকা বাতাসে অনেক বাড়ির বেড়া বা টিন যায় উড়ে। এমন দুর্যোগে গ্রামের মানুষ পাশের উঁচু স্থানে আশ্রয় নেয়। অবশ্য শরীয়তপুরের মনাই হাওলাদারকান্দি গ্রামের ‘স্বপ্নের বাড়ির’ বাসিন্দাদের সেই ভয় নেই। বাঁশের তৈরি বাড়িগুলো এ বছরের বন্যায় ডোবেনি। বর্ষার পানি বাড়লেও সেটি ভেসে উঠছে। ঝোড়ো হাওয়ায় বাড়িটি দুলে ওঠে, কোনো অংশ উড়ে যায়নি। এসব বাড়িতে জ্বালানি, খাদ্য ও সুপেয় পানির বন্দোবস্তও রয়েছে।

দেশে প্রথমবারের মতো বন্যা-ঝড়-ভূমিকম্পসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহনশীল এমন তিনটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন বাংলাদেশের একদল গবেষক। গবেষক দলের নেতৃত্বে ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আইনুন নিশাত। বাড়িগুলো শুধু দেশে না, বিশ্বজুড়ে আগ্রহ তৈরি করেছে।

‘স্বপ্নের বাড়ি’ নামটি গ্রামবাসীরই দেওয়া। শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার মনাই হাওলাদারকান্দি গ্রামের পদ্মাপারে খুঁটি দিয়ে বাঁধা বাড়িগুলো। গত জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে বাড়িগুলোতে যেতে ছোট্ট একটি সাঁকো পেরোতে হলো। ভেতরে ঢুকতেই মনে হলো কোনো এক বৈজ্ঞানিক কল্পবাহিনীর জগতে প্রবেশ করেছি। ঘরের চারপাশের দেয়ালে সারি সারি গাছের চারা, ড্রামভর্তি মাছের পোনা। এক কোনায় ঘুরছে ছোট্ট একটি টারবাইন। মাঝখানে ছোট্ট একটি উঠানও আছে, পাশেই মুরগির খামার। ছাদে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার বড় ট্যাংক আর সৌরবিদ্যুতের প্যানেল। আছে দুটি শোয়ার ঘর, একটি বৈঠকখানা ও রান্নাঘর। পাশ দিয়ে ইঞ্জিনচালিত নৌকা গেলে ঢেউ এসে বাড়িতে ধাক্কা দেয়। তাতে স্বপ্নের বাড়ি হেলেদুলে ওঠে। প্রতিটি বাড়ির আয়তন প্রায় তিন কাঠা।

বাঁশের তৈরি এই বাড়ির নাম এলাকাবাসী দিয়েছে স্বপ্নের বাড়ি। এটি বন্যায় ডুববে না, ঝড়ে উড়ে যাবে না, ভূমিকম্পে ভাঙবে না। পদ্মার পাড়ে শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার মনাই হাওলাদারকান্দি গ্রামে এই বাড়ি একটি হতদরিদ্র পরিবারকে দেওয়া হয়েছে। ছবি: প্রথম আলো

একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরে যত বিদ্যুৎ দরকার হয় তার পুরোটাই সৌর জ্বালানি থেকে আসছে। সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনে সহায়তা করেছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মো. খলিলুর রহমান ও তাঁর দল। বায়ুচালিত টারবাইনের সহায়তায় বৃষ্টির পানি পৌঁছে যাচ্ছে রান্নাঘর, টয়লেট ও অন্যান্য স্থানে। ঝড়ে যাতে বাড়িটি ভেসে না যায়, সে জন্য নোঙরের ব্যবস্থাও আছে। বন্যা থেকে রক্ষার জন্য বাড়ির নিচে আছে সারি সারি তেলের খালি ড্রাম। এতে বন্যা এলেও বাড়িগুলো ভেসে উঠছে।

এ ধরনের বাড়ি নির্মাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গবেষক দলের প্রধান অধ্যাপক আইনুন নিশাত প্রথম আলোকে বলেন, বন্যা ও ঝড়ের মতো জলবায়ু পরিবর্তনের যেসব ঝুঁকি দেশের উপকূল ও চরে এসে হানা দিচ্ছে, তা মোকাবিলায় সক্ষম করে বাড়িগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। যাতে দুর্যোগের সময় বাড়ির বাসিন্দাদের কোনো সমস্যা না হয়; বরং বাড়িতে উৎপাদিত খাদ্য বিক্রি করে তাঁরা সারা বছর চলতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ধরনের বাড়ি শুধু বাংলাদেশেই না, বিশ্বে প্রথম বলে জানান তিনি।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চের (সিথ্রিআর) একটি প্রকল্পের অংশ হিসেবে এই তিনটি বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। মনাই হাওলাদারকান্দি গ্রামের বাসিন্দাদের চাহিদা ও পরামর্শকে আমলে নিয়ে বাড়ির নকশা তৈরি করেছেন সিথ্রিআরের কর্মীরা। গ্রামের তিনটি পরিবারকে বাড়িগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি পরিবার সেখানে থাকছে, বাকি দুটি পরিবার বাড়ির মুরগির খামার ও সবজিবাগান রক্ষণাবেক্ষণ করছে। বাড়িগুলো থেকে প্রাথমিকভাবে মাসে ৩০ হাজার টাকা আয় হচ্ছে, যা তিনটি পরিবার সমানভাবে ভাগ করে নিচ্ছে।

বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান কুশলী ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শুভ্র দাশ ভৌমিকের নেতৃত্বে স্থানীয় কারিগরেরা বাঁশ দিয়ে বাড়িগুলো নির্মাণ করেছেন। বাড়ির নকশা ও পরিকল্পনায় ছিলেন যুক্তরাজ্যের ডান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশি গবেষক নন্দন মুখার্জি। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, মূলত স্থানীয় বাঁশ দিয়ে বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও তা সরবরাহের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘বাড়িটি একই সঙ্গে পরিবেশবান্ধব ও স্বল্প খরচে নির্মাণ সম্ভব। এখান থেকে কোনো কার্বন নিঃসরণ হবে না। বাড়ির বাসিন্দারা বাড়িগুলো ঠিকমতো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারলে দেশের অন্যান্য স্থানে আমরা এ ধরনের বাড়ি বানানোর কথা চিন্তা করছি।’

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিটি বাড়ি বানাতে সব মিলিয়ে গড়ে ১০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। তবে এখন তা ৫ লাখ টাকায় বানানো সম্ভব। বাড়ির নির্মাণকৌশল ও নকশা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। যাতে যে কেউ এ ধরনের বাড়ি বানাতে পারে। বাণিজ্যিকভাবে এমন বাড়ি নির্মাণ করতে খরচ ৩ লাখ টাকায় নামিয়ে আনা সম্ভব।

যাদের বাড়িগুলো বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা গ্রামের হতদরিদ্র। বাড়িগুলো এখন ওই পদ্মাপারের মানুষের সবার যে আগ্রহের বিষয় তা দুপুর গড়াতেই স্পষ্ট হলো। মনাই হাওলাদারকান্দির বাসিন্দারা তো বটেই, আশপাশের গ্রামের মানুষেরাও দল বেঁধে বাড়ি তিনটি দেখতে আসছে। দিনে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ শ দর্শনার্থী সেখানে আসে। এলাকাবাসীর আগ্রহের কারণে সেখানে বাজার গড়ে উঠেছে। শুক্র ও শনিবার সেখানে রীতিমতো মেলা বসে।

বাঁশের তৈরি ওই স্বপ্নের বাড়ির বাসিন্দা আমিরুন নেসা প্রথম আলোকে বলেন, ‘এত দিন থাকতাম ভাঙা ঘরে। বৃষ্টি আসলে পানি পড়ত, ঝড় আসলে চালা উড়ে যেত, আর বন্যা আসলে ডুবে যেত। আমার এই স্বপ্নের বাড়ি এই সব বিপদ মোকাবিলা করে টিকে আছে।’

শুধু এলাকার মানুষ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের জলবায়ু অভিযোজন নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানের গবেষকেরা ওই বাড়িগুলো দেখতে আসছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের দুটি সংবাদ সংস্থার কর্মীরা বাড়িগুলোর ওপরে তথ্যচিত্র নির্মাণ করছেন। স্থানীয় জনগণ কীভাবে ওই বাড়ির ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা রাখছে, তা দেখতে শরীয়তপুরে গিয়েছিলেন যুক্তরাজ্যের ডান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইওয়ানফেইজি। দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের একটি সংস্থা এ ধরনের বাড়ি দেশের অন্যান্য স্থানে নির্মাণ করা যায় কি না, তার সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখছে। বন্যা ও ঝড়ের সময় অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে এমন বাড়ি কাজে লাগানো সম্ভব বলে ব্র্যাকের গবেষক দলটি মনে করছে। তাদের প্রাথমিক হিসাবে জরুরি প্রয়োজনে বাড়িটিতে একসঙ্গে ২৫ জন আশ্রয় নিতে পারবে।

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত প্যানেলের (আইপিসিসি) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের কারণে বাংলাদেশের ৩০ শতাংশ এলাকার মানুষ বিপদে আছে। এর বাইরে বাংলাদেশের চর, হাওর, বিল এলাকাসহ নিম্নাঞ্চলের ২০ শতাংশ ফি বছরের বন্যায় ডুবে যায়।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাড়িটি কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারবে-জানতে চাইলে ডান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক জন রওয়ান প্রথম আলোকে বলেন, শুধু বাংলাদেশে নয়, আফ্রিকা ও ইউরোপের অনেক দেশে এ ধরনের বাড়ির চাহিদা রয়েছে। এমনকি দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার বন্যাপ্রবণ এলাকায় এমন বাড়ি অনেক মানুষের জীবন ও সম্পদ বাঁচাতে পারে।